কেন এই হাতবই

স্বাস্থ্য বলতে অনেকেই চিকিৎসা বা হাসপাতালের কথা বুঝে থাকেন । কেউ কেউ আবার বলেন, স্বাস্থ্য মানে মোটাসোটা চেহারা । স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই সব ধারণা কি ঠিক ? তাহলে স্বাস্থ্য মানে কী ? জনস্বাস্থ্য বলতেই বা কী বুঝব ? তার সঙ্গে আবার জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের কথা বলা হচ্ছে । তারই বা মানে কী ? এই সব বিষয়ে অনেকের মধ্যেই সাধারণত ভুল ধারণা লক্ষ করা যায় ।

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকার জন্য সব সময় টাকাকড়ির দরকার নেই । সকলে মিলে চেষ্টা করলে কোনো গ্রাম সংসদ এলাকার জনসাধারণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারেন । এর জন্য অবশ্য প্রত্যেকেরই কিছু কিছু দায়িত্ব আছে । সরকার বা গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো গ্রাম সংসদ এলাকার স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বার খাওয়ার আগে সেই এলাকার মানুষের হাত ধুইয়ে দিতে পারে না । এই দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষকে নিজের হাতে নিতে হবে । এর জন্য অবশ্য প্রত্যেককে বুঝতে হবে - প্রত্যেক বার খাওয়ার আগে কেন হাত ধুতে হবে এবং হাত ধুয়ে না খেলে শরীরের কী ক্ষতি হবে । এটি হল ব্যক্তিগত দায়িত্বের একটি উদাহরণ ।

সকলে মিলে ভালো থাকার জন্য স্বাস্থ্যের নানান দিক সম্বন্ধে কোনো এলাকার সমস্ত মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি । আবার এই ভালো থাকার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তাও সকলের জানা ও মেনে চলা দরকার । অন্য দিকে, জনসাধারণকে সুস্থ রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কী কী পরিষেবা দেওয়া হয় এবং সেগুলি কোথায় ও কীভাবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধেও সকলের জেনে-বুঝে নেওয়া দরকার । কিন্তু এই সব বিষয়ে তাঁরা জানাবেন বা বুঝবেন কীভাবে ? জনসাধারণের মধ্যে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর উপায়ই বা কী ?

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঞ্চালনায়, গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার জন্য পাড়া বৈঠকে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে । পরিকল্পনা রূপায়ণের অঙ্গ হিসাবে, জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা শিবির করার সময়, এই সব বিষয়কে সহজ অথচ গভীর ভাবে বোঝার জন্য এই হাতবইটির প্রয়োজন ছিল । একই সঙ্গে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের জন্য দরকার - গণ-উদ্যোগ তৈরি করা এবং জনস্বাস্থ্যের নানান দিক সম্বন্ধে পাড়া বৈঠক, দেওয়াল লিখন, প্রচার, স্থানীয় ভাষায় গান, স্থানীয় ভাষায় নাটক ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে, দলগত পঠন ও শিখন প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ দলগত ভাবে এই হাতবইটি পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে, সকলেই জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারছেন । জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁরা যা জানলেন ও বুঝলেন, সে সম্বন্ধে তাঁরা নিজের নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন । এরপর তাঁদের দায়িত্ব হবে, প্রতিবেশীদের সঙ্গেও এই সব বিষয়ে আলোচনা করা । এইটি হল সামাজিক দায়িত্বের একটি উদাহরণ ।

কোনো এলাকার জনসাধারণ জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হলে এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানত নিজেদের হাতে নিতে পারলে তবেই এই উদ্যোগ সফল হবে । প্রত্যেক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির জনস্বাস্থ্য কার্যকরী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সকল সদস্যকে এই উদ্যোগ সফল করার দায়িত্ব নিতে হবে ।

মানবেন্দ্র নাথ রায়, ২১.৬.০৭

ড. মানবেন্দ্র নাথ রায়

মার্চ ২০০৭

প্রধান সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১) স্বাস্থ্য মানে কী ?

উঃ স্বাস্থ্য বলতে কেউ কেউ চিকিৎসার কথা বুঝে থাকেন । কেউ কেউ আবার স্বাস্থ্য বলতে বোঝেন মোটাসোটা চেহারা । কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই সব ধারণা ঠিক নয় । মনে রাখা দরকার যে, কেবল অসুখ না হওয়াকে স্বাস্থ্য বলা যায় না । কেবল মাত্র শরীরের দিক থেকে সুস্থ থাকাটাই স্বাস্থ্য নয়, মনের দিক থেকে ভালো থাকাটাও স্বাস্থ্যের মধ্যে পড়ে । আবার সমাজকে বাদ দিয়ে সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব নয় । তাই স্বাস্থ্য মানে হল শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকা ।

২) জনস্বাস্থ্য মানে কী ?

উঃ জনস্বাস্থ্য বলতে কোনো একটি এলাকার সব শ্রেণীর জনগণের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকা বোঝায় । সেই জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়টির মধ্যে শুধু স্বাস্থ্যের কথা বলা হয় না । এর মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, পুষ্টি, পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি । তাই, কেবল মাত্র নিজের নয়, এলাকার সমস্ত মানুষের এবং পরিবেশের সুস্থ থাকাটাও জনস্বাস্থ্যের আওতায় পড়ে ।

৩) স্বাস্থ্যবিধান মানে কী ?

উঃ মলমূত্র এবং সব রকম বর্জ্য পদার্থের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অপসারণ করা এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা হল স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা । স্বাস্থ্যবিধানের মধ্যে পড়ে - স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করা, ধোঁয়াহীন চুল্লী ব্যবহার করা, নিয়মিত দাঁত মাজা, নিয়মিত স্নান করা, নিয়মিত নখ কাটা, বাড়ির বাইরে চটি বা জুতো পরে হাঁটা, যেখানে সেখানে থুতু না ফেলা, নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার করা, জলশৌচের পরে এবং খাবার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া, ঋতুস্রাবের সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পরিষ্কার পোশাক পরা, নোংরা জল নিকাশের ভালো ব্যবস্থা করা, পরিবেশকে জঞ্জালমুক্ত রাখা ইত্যাদি ।

♦ প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য

৪) একজন গর্ভবতী মহিলাকে কখন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নাম লেখাতে হবে ?

উঃ গর্ভবতী হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ মহিলাকে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা সরকারি হাসপাতালে নাম লেখাতে হবে । তিন মাসের মধ্যে নাম লেখানোই সবচেয়ে ভালো।

গর্ভসঞ্চার হবে যার
নামটি লিখিও গিয়ে সেন্টার

কোনো গর্ভবতী মহিলা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা সরকারি হাসপাতালে নাম লেখালে তবেই গর্ভবতীকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসূতিকালীন সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি পেতে পারেন । নাম লেখানোর পর গর্ভবতী মহিলার নামে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার কার্ড করে দেওয়া হয় । গর্ভবতী মহিলাকে এবং প্রসবের পর শিশুকে কখন কী কী টিকা নিতে হবে এগুলিও সেই কার্ডে লেখা থাকে। নাম লেখানো হলে এলাকায় কত জন মহিলা গর্ভবতী হচ্ছেন বা কত জন শিশুর জন্ম হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কোনো গর্ভবতী মহিলা ও শিশু মারা যাচ্ছেন কিনা সেই বিষয়টিও বোঝা যায় । এলাকার স্বাস্থ্যের অবস্থা বোঝার জন্য এই ধরনের তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

৫) গর্ভবতী মহিলাকে কখন টিটেনাস টিকা নিতে হবে ?

উঃ গর্ভবতী হওয়ার পর টিটেনাস টিকা নিলে মা ও শিশুর ধনুষ্টঙ্কার হওয়ার ভয় থাকে না । গর্ভবতী হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রথম বার টিটেনাস টিকা এবং তার ঠিক এক মাস পরে দ্বিতীয় বার টিটেনাস টিকা নিতে হবে । অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাকে অবশ্যই দুই বার টিটেনাস টিকা নিতে হবে । এই টিকা সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যায় ।

গর্ভবতীর মনের আশ
দুমাসে দুটি টিকা টিটেনাস
থাকবে না ভয় করে আর
মা ও শিশুর ধনুষ্টঙ্কার

৬) গর্ভবতী মহিলাকে কয়টি আয়রন বড়ি কীভাবে খেতে হবে ?

রক্তের বড়ি একশোটি
ভরা পেটে খাবে রোজ একটি

যাদের রক্তাল্পতা ঘুব বেশি

রক্তের বড়ি দুশোটি
ভরা পেটে খাবে রোজ দুটি

উঃ গর্ভবতী মহিলাকে রোজ দুপুরে অথবা রাতে খাবার খেয়ে, ভরা পেটে, শোবার আগে, ১টি করে মোট ১০০ টি আয়রন বড়ি খেতে হবে । যে সব গর্ভবতী মহিলার খুব বেশি রক্তাল্পতা আছে, তাদের দুবেলা ১টি করে রোজ ২টি বড়ি, খাবার খাওয়ার পরে, ভরা পেটে খেতে হবে । তারপর শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে । অনেক সময় খালি পেটে আয়রন বড়ি খেলে বমি আসে, তাই খালি পেটে এটি খাওয়া উচিত নয় । আবার কারুর কারুর ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক দিন একটু বমি বমি ভাব আসে, কিন্তু ভরা পেটে খেয়ে বিশ্রাম নিলে তা অল্প দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। এই সময় প্রচুর পরিমাণে শুদ্ধ পানীয় জল খেতে হবে এবং রোজ খাবারের মধ্যে ডাল ও সব্জি খেতে হবে।

৭) শরীরে রক্তাল্পতা আছে কিনা তা কীভাবে বোঝা যাবে ?

উঃ চোখের নীচে অথবা নখের ডগা, জিভ, ইত্যাদির রং ফ্যাকাসে হয়ে গেলে রক্তাল্পতা হয়েছে বলে বোঝা যায় । সাধারণত গর্ভবতী থাকার সময় এটি বেশি হয়ে থাকে । শরীরে রক্তের মধ্যে লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ যতটা থাকা দরকার, তার থেকে কমে গেলে তাকে রক্তাল্পতা বলে ।

৮) গর্ভবতী মহিলাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কত বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে ? কী কী পরীক্ষা করাতে হবে ?

কম করেও চারটি বার
গর্ভবতী দেখাবে গিয়ে সেন্টার

মাঝে মাঝে মাপালে প্রেসার
ছোটো সন্তান হবে না আর

উঃ গর্ভবতী থাকার সময় কমপক্ষে প্রথম তিন মাসে একবার, দ্বিতীয় তিন মাসে একবার এবং শেষ তিন মাসে অন্তত দুই বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে । অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক গর্ভবতী মাকে কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে । কেউ চাইলে বা দরকার পড়লে এর থেকেও বেশি বার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারেন। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় দেখা দরকার শরীরে রক্তাল্পতা আছে কিনা, ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ বেশি বা কম আছে কিনা, গর্ভবতীর ওজন ঠিকমতো বাড়ছে কিনা, গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা কী রকম ইত্যাদি । এই সকল স্বাস্থ্য পরীক্ষা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে করা হয়।

৯) গর্ভবতী মহিলাকে কতবার খাবার খেতে হবে ?

এলো সন্তান গর্ভে যার
পেটটি ভরে খাওয়াবে তার

উঃ কেউ কেউ মনে করেন যে গর্ভবতী থাকার সময় কোনো গর্ভবতী মহিলাকে পেট ভরে খাওয়ালে, পেটের শিশুটি আকারে বড় হয়ে যাবে এবং প্রসবকালে কষ্ট হবে । সেই জন্য গর্ভবতী থাকার সময় তাকে

কম খেতে দেওয়া হয় । এই ধারণা পুরোপুরি ভুল । কোনো মহিলা স্বাভাবিক অবস্থায় যা খাবার খেতেন, গর্ভবতী থাকার সময় তাকে তার থেকে বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে । মা ও গর্ভস্থ শিশু দুজনের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

১০) গর্ভবতী মহিলাকে কী কী খাবার খেতে হবে ?

উঃ আমরা সাধারণভাবে যে সব খাবার খাই, সেগুলি মূলত চারটি রঙের মধ্যেই হয়ে থাকে এবং তাতে যথেষ্ট পুষ্টিও পাওয়া যায় । এই চারটি রঙ হল লাল বা কমলা (টমাটো, পাকা কুমড়ো, মাংস ইত্যাদি), হলুদ (ডাল, ডিম, গাজর ইত্যাদি), সবুজ (শাকসব্জি), সাদা (ভাত, দুধ ইত্যাদি)। গর্ভবতী মহিলাকে এই চারটি রঙের খাবার যথেষ্ট পরিমাণে খেতে হবে ।

> লাল, হলুদ, সবুজ, সাদা
> পোয়াতি খাবে গাদা গাদা

১১) গর্ভবতী মহিলার কতটা সময় বিশ্রামের প্রয়োজন ?

উঃ গর্ভবতী মহিলার রাতে ৮ ঘণ্টা এবং দিনে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম প্রয়োজন। মা ও গর্ভস্থ শিশু দুজনেরই স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । গর্ভবতী মহিলার খুব ভারি কাজ করা উচিত নয় । এতে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে ।

১২) প্রসবের আগে কী কী প্রস্তুতির প্রয়োজন ?

উঃ
- স্বাস্থ্যকর্মী দিদির কাছ থেকে প্রসবের সম্ভাব্য দিন জেনে নিতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু টাকা জমিয়ে রাখতে হবে ।
- গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগে থেকে গাড়ি বলে রাখতে হবে ।

- গর্ভবতী মহিলার সঙ্গে কে যাবেন তা আগে থেকে ঠিক করে রাখতে হবে ।
- স্বনির্ভর দলের মহিলারা এই কাজে সাহায্য করতে পারেন, তাই তাদের সঙ্গেও বারবার আলোচনা করতে হবে ।

মনে রাখতে হবে, হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসব হওয়াটাই সব দিক থেকে ভালো । কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় বা নিয়ে যাওয়ার আগেই বাড়িতে প্রসব হয়ে যায়, সে জন্যও কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার । যেমন -

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই-মাকে খবর দিয়ে রাখতে হবে ।
- পাঁচটি পরিষ্কারের কথা মনে রাখতে হবে । যেমন - (অ) পরিষ্কার জায়গা, (আ) পরিষ্কার হাত, (ই) পরিষ্কার সুতো, (ঈ) পরিষ্কার (নতুন) ব্লেড, এবং (উ) পরিষ্কার নাড়ি ।

প্রসবের সময় পাঁচ পরিস্কার
রেখো সবাই মনে বার বার

নতুন ব্লেড, নতুন সুতো, সাবান এবং কেচে রোদে শুকনো নরম দুইটি কাপড় প্রস্তুত রাখতে হবে । পরিষ্কার সুতো পাওয়ার জন্য সুতোটিকে ২০ থেকে ৩০ মিনিট গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে । পরিষ্কার নাড়ি বলতে বুঝতে হবে যে, কাটা নাড়িতে কোনো ওষুধ বা তেল বা ব্যান্ডেজ বা অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না ।

১৩) ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা বলতে কাদের বোঝায় ?

উঃ যে সকল গর্ভবতী মহিলার গর্ভধারণের বয়স ১৮ বছরের নীচে বা ৩৫ বছরের উপরে, উচ্চতা ১৪০ সেন্টিমিটারের কম, ওজন ৪০ কেজির কম, রক্তাল্পতা (১২ শতাংশের কম) আছে, অতিরিক্ত রক্তচাপ (১৪০/৯০ বা তার বেশি), তিনটি বা তার বেশি গর্ভপাত হয়েছে, আগে মৃত শিশুর জন্ম দান করেছেন কিংবা আগের শিশুর ওজন ২.৫ কেজির কম ছিল সেই সকল গর্ভবতী মহিলা ঝুঁকিপূর্ণ। এই সকল ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ যত্ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৪) প্রসবকালীন বিপদের লক্ষণগুলি কী কী ?

উঃ প্রসবকালীন বিপদের লক্ষণগুলি হল ঃ

- ১২ ঘণ্টা বেশি প্রসব বেদনা
- অতিরিক্ত রক্তপাত
- আধ ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়া
- ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ বেশি থাকা বা পা ফোলা
- খিঁচুনি হওয়া
- সময়ের আগে জল ভাঙ্গা

জন্মের পর প্রথম বার
শিশু খাবে দুধ মায়ের তার

১৫) প্রসবের সময় শিশুকে সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে হলে কী কী করতে হবে ?

উঃ প্রসবের সময় শিশুকে সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে হলে নীচের বিষয়গুলি মেনে চলতে হবে -

- পরিষ্কার আলো হাওয়া যুক্ত জায়গায় প্রসব করাতে হবে ।
- নতুন ব্লেডে নাড়ি কাটতে হবে এবং পরিষ্কার সুতো দিয়ে নাড়ি বাঁধাতে হবে ।
- কাটা নাড়িতে কোনো কিছু লাগানো যাবে না ।
- যথা সম্ভব কম লোকজন শিশুকে ধরবে । কারণ, বাইরের জামা-কাপড়ে ও নোংরা হাতে শিশুকে ধরলে শিশুর নানা রকম রোগ সংক্রমণ হতে পারে ।
- জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে তার মায়ের বুকের প্রথম গাঢ় হলুদ দুধ (শাল দুধ/কোলোস্ট্রাম) খাওয়াতে হবে ।
- জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে '০' ডোজ পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে এবং বিসিজি টিকা দিতে হবে । যদি জন্মের সাথে সাথে শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে ২০ দিনের মধ্যে তাকে পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে এবং বিসিজি টিকা দিতে হবে।

পরিস্কার কাপড়ে পরিস্কার হাতে
ভুলোনা শিশুকে মুছিয়ে দিতে

ভিজে কাপড়টি ফেলে দিয়ে
শিশুকে রাখো মা-র বুকে গিয়ে
জাপটে ধরবে মা শিশুকে পেয়ে
হবে মায়ে ছায়ে গায়ে গায়ে

১৬) জন্মের পর শিশুর কী ধরনের পরিচর্যা করতে হবে ?

উঃ
- জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শিশুকে আলতো করে মুছিয়ে দিতে হবে । তারপর আর একটা শুকনো কাপড় দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে রাখতে হবে ।

- শিশুকে পরিষ্কার করেই তার জন্ম ওজন নিতে হবে ।
- এরপর শিশুকে মায়ের বুকে দিতে হবে ।
- নাভি না খসে পড়া পর্যন্ত শিশুকে স্নান করানো চলবে না । আগে জন্মের সাথে সাথে শিশুকে স্নান করানো হত । এখনো অনেক জায়গায় এটি করানো হয়ে থাকে, বিশেষ করে বাড়িতে প্রসবের পরে । এতে শিশুর ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে । অনেক সময় শিশুকে তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে রাখা হয় । এটিও ঠিক নয় । এতে শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় ।
- নাভি খসে যাওয়ার পর শিশুকে যখন স্নান করানো হবে, তখন বাইরে খোলা জায়গায় স্নান করানো যাবে না । তাই বন্ধ ঘরে, গা-সওয়া গরম জলে শিশুকে স্নান করাতে হবে। তারপর পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে মুছিয়ে মায়ের বুকে দিয়ে দিতে হয় ।

১৭) জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিপদের লক্ষণগুলি কী কী ?

উঃ জন্মের সময়ে শিশুর বিপদের লক্ষণগুলি হলো ঃ

- ♦ জন্মের পর শিশুর না কেঁদে ওঠা
- ♦ মায়ের বুকের দুধ না টানতে পারা
- ♦ শিশুর হাতের তালু, পায়ের তালু ঠান্ডা হয়ে যাওয়া
- ♦ শিশুর হাতের তালু, পায়ের পাতা হলদে বা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া
- ♦ শিশুর শরীর নীল হয়ে যাওয়া

১৮) জন্মের পর শিশুকে কী খাওয়াতে হবে ?

উঃ জন্মের সাথে সাথেই শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে । ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধই খাওয়াতে হবে। এই সময় তাকে জল, মিছরির জল, মধু, দুধ বা অন্য কোনো পানীয় খাওয়ানো যাবে না। মায়ের দুধের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সব খাদ্য ও জল শিশু পেয়ে যাবে।

না টানলে শিশু দুধ মায়ের
জেনো অবস্থা, ভীষণ ভয়ের

না দিও জল, না দিও ফল
না দিও তারে মধু
ছয় মাস ধরে শিশুকে দিও
মায়ের দুধই শুধু

১৯) ৬ মাস থেকে ১২ মাস বয়সের শিশুকে কী খাওয়াতে হবে ?

উঃ ৬ মাস থেকে ১২ মাস বয়সের শিশুকে মায়ের বুকের দুধের সাথে সাথে অল্প অল্প করে আধাশক্ত খাবার খাওয়াতে হবে । কারণ, এই সময় শিশুর বৃদ্ধির জন্য শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধই যথেষ্ট নয়। মায়ের বুকের দুধের সাথে সাথে অন্যান্য ঘরোয়া খাবারও প্রয়োজন । যেমন - ভাত, ডাল, শাকসব্জি ইত্যাদি ।

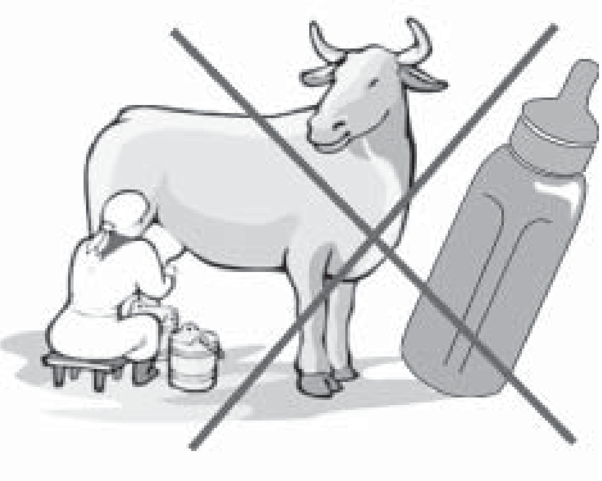

শিশুর বয়স ৬ মাস হলেই

শাক সব্জি ডাল ভাত -

মাও খাবে শিশুও খাবে

পেড়ে একই রকম পাত ।

২০) ১ থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুর খাবার কী হবে ?

উঃ এই সময় আস্তে আস্তে শিশুকে বাড়ির খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে । ২ বছরের পর শিশুকে বাড়ির খাবার নিজের হাতে খেতে অভ্যাস করাতে হবে ।

গাই বা কৌটোর দুধ খাওয়ালে পরে
সর্দি, কাশি, হাঁপানি জাপটে ধরে

খায় যারা দুধ - কৌটোর বা গাইয়ের
বুদ্ধি ভালো হয় না তাদের

২১) সার্বিক টিকাকরণ মানে কী ?

উঃ সার্বিক টিকাকরণ বলতে বোঝায় শিশুর এক বছর বয়সের মধ্যে যে যে টিকাগুলি পাওয়া দরকার, সেই সব টিকাগুলি সম্পূর্ণ হওয়া । অর্থাৎ জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব '০' ডোজ পোলিও এবং বি.সি.জি., দেড় মাসে ডি.পি.টি. ও পোলিও-র প্রথম ডোজ, আড়াই মাসে ডি.পি.টি. ও পোলিও-র দ্বিতীয় ডোজ, সাড়ে তিন মাসে ডি.পি.টি. ও পোলিও-র তৃতীয় ডোজ এবং নয় মাস পূর্ণ হলে হামের টিকা সম্পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করাটাই হল সার্বিক টিকাকরণ ।

২২) কোন বয়সে শিশুর কোন টিকা নেওয়া প্রয়োজন ?

উঃ প্রত্যেক শিশুর যে বয়সে যে টিকা নেওয়া প্রয়োজন, তা নীচের তালিকাতে দেওয়া হল ঃ

কোন টিকা → / কোন সময় ↓	বি.সি.জি.	ডি.পি.টি.	পোলিও	হামের টিকা	ভিটামিন 'এ' তেল	ডি.টি. বুস্টার	টিটেনাস টিকা
জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব	এক বার		শূন্য ডোজ				
দেড় মাসে		প্রথম ডোজ	প্রথম ডোজ				
আড়াই মাসে		দ্বিতীয় ডোজ	দ্বিতীয় ডোজ				
সাড়ে তিন মাসে		তৃতীয় ডোজ	তৃতীয় ডোজ				
নয় মাস পূর্ণ হলে				এক বার	প্রথম বার		
১৮ মাস হলে		বুস্টার ডোজ	প্রথম বুস্টার ডোজ		দ্বিতীয় বার		
২৪ মাস বা ২ বছর বয়সে					তৃতীয় বার		
আড়াই বছর বয়সে					চতুর্থ বার		
তিন বছর বয়সে					পঞ্চম বার		
পাঁচ বছর বয়সে			দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ			এক বার	
১০ বছর বয়সে							প্রথম বার
১৬ বছর বয়সে							দ্বিতীয় বার

** এছাড়া যতবার পালস্ পোলিও অভিযান হবে, ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশুকেই পোলিও টিকা খাওয়ানো দরকার ।

শিশুর জন্ম হলেই পরে
বিসিজি পোলিও টিকা দিও মনে করে

শিশুর বয়স নয় মাস যবে
হামের টিকা একটি দেবে

বয়স হলে দেড় মাসটি
দিও তারে টিকা পোলিও ডি.পি.টি.

পরে এক মাস ছেড়ে আবার দেবে তারে
আরো টিকা দুটি, পোলিও ডি.পি.টি.

দেড়টি বছর বয়স হলে
পোলিও, ডি.পি.টি. বুস্টার দিলে

৫ টি বছর বয়স যবে
একটি ডিটি বুস্টার দেবে

২৩) কোন টিকা কীসের জন্য দেওয়া হয় ?

কোন টিকা	কোন রোগের প্রতিষেধক
বি.সি.জি. (ইঞ্জেকশন)	যক্ষ্মা
ওরাল পোলিও (ও.পি.ভি.) (মুখে খাওয়ানো হয়	পোলিও
ডি.পি.টি. (ইঞ্জেকশন)	ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাস
হাম (ইঞ্জেকশান)	হাম
ভিটামিন 'এ' তেল (মুখে খাওয়ানো হয়)	রাতকানা বা অন্ধত্ব
ডি.টি. (ইঞ্জেকশান)	ডিপথেরিয়া ও টিটেনাস

২৪) টিকা (ইঞ্জেকশন) নেওয়ার সময় ও পরে কী কী করা যাবে না ?

- টিকা নেওয়ার জায়গায় মালিশ করা চলবে না ।
- টিকা নেওয়ার জায়গায় তেল লাগানো চলবে না ।
- কোনা রকম শরীর খারাপ হলেও স্বাভাবিক খাবার, অর্থাৎ মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা চলবে না ।

২৫) ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুর যত্ন কীভাবে নিতে হবে ?

- পাঁচ বছর বয়সে শিশুকে ডি.টি. বুস্টার টিকা দেওয়াতে হবে ।
- খাওয়ার আগে হাত ধোওয়া, নিয়মিত নখ কাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা পরা, নিয়মিত চুল আঁচড়ানো ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে ।
- স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিশুকে নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

এমনি করেই বাড়বে শিশু
বছর দুই বা পরে
ছোট্ট শিশু হলো বড়
সবার হাতটি ধরে

২৬) জন্মের সাথে সাথে কেন শিশুর ওজন নেওয়া দরকার ?

উঃ শিশুর জন্মের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর ওজন নিতে হবে । এই ওজনটিই হল শিশুর 'জন্ম ওজন' । 'জন্ম ওজন' জানতে পারলে শিশুটি পুষ্ট না অপুষ্ট তা বোঝা যায় । আড়াই কেজির কম ওজনের শিশুর জন্ম হলে বুঝতে হবে শিশুটি অপুষ্ট ও দুর্বল । এই কারণে বাড়ির লোকের শিশুর 'জন্ম ওজন' জেনে নেওয়া উচিত । যাতে যথাযথ ওজনের শিশুর জন্ম হয় কিংবা অপুষ্ট শিশুর কেমন পরিচর্যা দরকার তা জানার জন্য প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়টি সকলেরই বোঝা দরকার ।

জন্মের পরই শিশুর ওজন
নিয়ে লিখে রাখা অতি প্রয়োজন
তার পর মাসে মাসে এক বার
শিশুর ওজন নেওয়া দরকার
ওজন কেন ? পুষ্টি কীসে ?
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসে
শিখতে হবে বারংবার
রাখতে বজায় শিশুর বাড়

২৭) শিশুর ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা কোথায় আছে ? কত দিন পরপর শিশুর ওজন নেওয়া দরকার ?

উঃ হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশুর জন্মের সাথে সাথে ওজন নেওয়া হয় । কিন্তু কোনো কারণে বাড়িতে শিশু প্রসব হলে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ডেকে শিশুর ওজন নেওয়াতে হবে । অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রতি মাসে শিশুদের ওজন নেওয়া হয়।

ওজন করার পর সেটি শিশুর কার্ডে লিখে দেওয়া হয় এবং শিশুর পুষ্টির মান শিশুর মাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ।

প্রতি মাসে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুর ওজন নেওয়া দরকার । কারণ শিশু ঠিকভাবে বাড়ছে কিনা তা জানার একমাত্র এবং সহজ উপায় হল শিশুর নিয়মিত ওজন নেওয়া । এই ভাবে ছয় বছর পর্যন্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রতি মাসে একবার শিশুর ওজন নেওয়া উচিত।

২৮) কম ওজনের শিশু বা অপুষ্ট শিশু বোঝা যাবে কীভাবে ?

উঃ যে সব শিশুর 'জন্ম ওজন' আড়াই (২.৫) কেজির কম, তাদের 'কম জন্ম ওজনের শিশু' বলা হয় । আড়াই কেজির কম ওজনের শিশুর জন্ম হলে বুঝতে হবে শিশুটি অপুষ্ট ও দুর্বল । সাধারণত কম ওজনের শিশুদের পুষ্টির ঘাটতি থাকে এবং তারা অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হয় । তাছাড়া, বয়স অনুপাতে ওজন ও উচ্চতা না বাড়লে বুঝতে হবে শিশুটি অপুষ্ট । অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাছে এ বিষয়ে জেনে নিতে হবে এবং প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ।

২৯) যাতে কম জন্ম ওজনের শিশু না হয় তার জন্য কী কী করা দরকার ?

উঃ যাতে কম ওজনের শিশুর জন্ম না হয়, তার জন্য নীচের বিষয়গুলি মেনে চলতে হবে ঃ

- গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা
- গর্ভবতী মহিলাদের আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া
- গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- গর্ভবতী মহিলাদের যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া
- ১৯ বছর বয়সের আগে মেয়েদের গর্ভবতী না হওয়া
- দুটি সন্তানের মধ্যে অন্তত তিন বছর ব্যবধান রাখা
- অধিক সন্তানের মা না হওয়া (জন্ম নিয়ন্ত্রণ)

৩০) কম জন্ম-ওজনের শিশুদের কী কী যত্ন নেওয়া দরকার ?

উঃ কম জন্ম ওজনের শিশুদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে । যেমন -

- শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী তাকে বারেবারে (শিশু যখনই চাইবে) মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে ।
- শিশুকে ততটাই গরম রাখতে হবে যাতে তার পায়ের তলা সব সময় গরম থাকে ।
- মা ছাড়া শিশুকে যেন আর কেউ না ধরে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- অত্যন্ত দুর্বল শিশু যদি দুধ টেনে খেতে না পারে তাহলে বুকের দুধ গেলে শিশুকে খাওয়াতে হবে।

৩১) শিশুর অপুষ্টি দূর করার উপায় কী ?

উঃ শিশুর অপুষ্টি দূর করার উপায়গুলি হল -

- শিশুকে ঠিক বয়সে ঠিক পরিমাণে খাবার খাওয়াতে হবে ।
- বাড়িতে যে খাবার সাধারণত পাওয়া যাবে, তা-ই স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে ও যত্ন করে খাওয়ালে শিশুর ওজন বাড়বে ।
- স্বাস্থ্যবিধানের নীতি অনুসরণ করে শিশুর পরিচর্যা করা প্রয়োজন এবং শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন ।
- ভিটামিন 'এ' তেল নয় মাস বয়স থেকে প্রতি ছয় মাস অন্তর পাঁচটি ডোজ নিয়মিত খাওয়াতে হবে ।
- প্রয়োজনে শিশুকে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে । স্বাস্থ্যকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাছে আয়রন ট্যাবলেট পাওয়া যায় ।
- যাতে শিশু নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায় এবং পরিষেবাগুলি পায় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ।

৩২) জন্ম থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সাধারণ ভাবে শিশুর কী কী রোগ হতে পারে ?

উঃ জন্মের প্রথম মাসের মধ্যে - জন্ম আঘাতজনিত কারণে অঙ্গহানি হতে পারে, ঠান্ডা লাগতে পারে, সংক্রমণ হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে বা জন্ডিস হতে পারে । সঠিক বয়সে টিকাগুলি না দিলে এই ছয়টি মারাত্মক রোগ হতে পারে - (ক) যক্ষ্মা, (খ) পোলিও, (গ) ডিপথেরিয়া, (ঘ) হুপিং কাশি, (ঙ) ধনুষ্টংকার এবং (চ) হাম । তাছাড়া যে কোনো বয়সে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

৩৩) শিশুদের শ্বাসনালী সংক্রমণ জনিত অসুখ কীভাবে রোধ করা যায় ?

উঃ শ্বাসনালীর বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ, বিশেষ করে নিউমোনিয়া শিশুদের অসুস্থতার ও মৃত্যুর একটি বড় কারণ । সাধারণত ঠান্ডা লেগে শিশুদের এই ধরনের অসুখগুলি হয় । বাড়ি ও আশপাশের দূষিত পরিবেশ এবং যত্নের অভাব শিশুদের শ্বাসনালী সংক্রমণ জনিত অসুখের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় । শুরুতেই যদি রোগটি ধরা পড়ে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের অসুখ সেরে যায় । তাই অসুস্থ শিশুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে ।

৩৪) শিশু-মৃত্যুর হার বলতে কী বুঝি ?

এক বছর সময়সীমার মধ্যে, ০ থেকে ১ এক বছর বয়সের (অর্থাৎ ৩৬৫ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত) প্রতি এক হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে যত জন শিশু মারা যায়, তাকে শিশু-মৃত্যুর হার বলা হয়।

৩৫) মাতৃত্ব-জনিত মৃত্যুর হার বলতে কী বুঝি ?

উঃ গর্ভধারণ থেকে প্রসবের পর ৪২ দিন পর্যন্ত প্রতি এক লক্ষ প্রসূতি মায়ের মধ্যে এক বছরে যত জন মহিলা মাতৃত্ব-জনিত কারণে মারা যান, তাকে মাতৃত্ব-জনিত মৃত্যুর হার বলা হয়।

৩৬) শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণগুলি কী কী ?

উঃ জন্মের এক মাসের মধ্যে যে সকল শিশু মারা যায় তাদের মৃত্যুর কারণগুলি বিশেষ ভাবে জানতে হবে এবং এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এই সময় মৃত্যুর কারণগুলি হল : সংক্রমণ, শিশুকে ঠিকভাবে গরম না রাখার জন্য শিশুর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, ডায়রিয়া, সঠিক সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া, খুব কম ওজন ইত্যাদি। আর যে সব কারণে যে কোনো বয়সের শিশু মারা যেতে পারে তা হল - ঠিক বয়সে ঠিক টিকা না দেওয়া, অপুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখা, ডায়রিয়া বা শ্বাসকষ্টজনিত রোগ।

৩৭) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কী ?

উঃ শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা এবং শিশুর বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশোনার জন্য সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের (আই.সি.ডি.এস.) আওতায় একটি করে কেন্দ্র আছে - এটিই হল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। প্রতি ১০০০ জনসংখ্যা পিছু ১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকার কথা। প্রত্যেক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও একজন সহায়িকা থাকেন।

৩৮) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মা ও শিশুর আসার দরকার কেন ? মা ও শিশু এখান থেকে কী কী পরিষেবা পেতে পারে ?

উঃ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই.সি.ডি.এস.) হল মা ও শিশুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি চলে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল -

- শিশুদের জন্য যত রকম পরিষেবা আছে, সেগুলিকে একত্রিত ভাবে শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া
- শিশুদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার কমানো
- শিশুরা যাতে স্কুলে যেতে উৎসাহ পায় তার ব্যবস্থা করা
- শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত শক্ত করা
- মায়েরা যাতে সঠিক ভাবে শিশুর যত্ন নিতে সক্ষম হন, তার ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী ও প্রসব হয়ে যাওয়ার পর প্রথম তিনমাস মায়েদের জন্য পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করা

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মা ও শিশু ছয় ধরনের পরিষেবা পেতে পারে। যেমন -

- শিশুদের জন্য পরিপুরক পুষ্টি
- টিকাকরণের ব্যবস্থা
- নিয়মিত ভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- প্রয়োজনে অসুস্থ শিশুকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা
- শিশুর পুষ্টি ও যত্নের ব্যাপারে মায়েদের শিক্ষা

৩৯) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি কত ধরনের ?

উঃ প্রতিবন্ধী কথাটি শুনতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বা তার পরিবারের কারুর কষ্ট বোধ হতে পারে। তাই প্রতিবন্ধী কথাটির পরিবর্তে ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সরকারি নীতি অনুযায়ী চার ধরনের প্রতিবন্ধী বা ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ মানুষ হতে পারে : (ক) অস্থি জনিত প্রতিবন্ধী, (খ) দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধী, (গ) মূক-বধির প্রতিবন্ধী, এবং (ঘ) মানসিক প্রতিবন্ধী। প্রত্যেক ধরনের প্রতিবন্ধীকে আবার চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (অ) মৃদু (৪০%-এর কম), (আ) মাঝারি (৪০% ও তার বেশি কিন্তু ৭৫%- এর কম), (ই) গুরুতর (৭৫% বা তার বেশি), এবং (ঈ) পুরোপুরি (১০০%)।

৪০) জননী সুরক্ষা যোজনা কী ?

উঃ এন.এম.বি.এস. (জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প) - এর পরিবর্তিত নাম জননী সুরক্ষা যোজনা। তফশিলী-জাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী যে কোনো পরিবারের ১৯ বছর বা তার উপরের বয়সের সন্তানসম্ভবা মাকে তার প্রথম দুটি জীবিত সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় এককালীন সহায়তা দেওয়া হয়। প্রসবের আগেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে ৫০০ টাকা পাওয়া যায়। তবে গর্ভাবস্থায় কম করে তিন বার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে তবেই এই সহায়তা দেওয়া হয়। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে প্রসবের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ঐ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতাল থেকে প্রসবের ৭ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খরচ বহন করার সুযোগ এই প্রকল্পের আওতায় আছে। প্রসবের সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে যাওয়ার খরচ বাবদ এক জন গর্ভবতী মহিলা তার বাড়ি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের দূরত্ব অনুযায়ী রেফারেল ট্রান্সপোর্ট স্কিমের আওতায় আরো কিছু আর্থিক সহায়তা পান, যেমন - ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ১৫০ টাকা, ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত ২৫০ টাকা এবং ২০ কিলোমিটারের বেশি হলে ৩৫০ টাকা।

এই সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে (বা এই সহায়তা ঠিক মতো না পেলে) প্রথমে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বি.এম.ও.এইচ. - এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৪১) বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা কী ?

উঃ বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা হল সমাজ কল্যাণ বিভাগের একটি প্রকল্প। এই সহায়তা সিডিপিও-র অফিস থেকে সরাসরি পাওয়া যায়। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী কোনো পরিবারের কন্যা সন্তানের জন্ম নিবন্ধীকরণের কাজ শেষ হলেই দুটি কন্যা সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত এককালীন ৫০০ টাকা এই প্রকল্পের আওতায় সহায়তা দেওয়া হয়। এই ৫০০ টাকা শিশুকন্যার নামে কাছাকাছি ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দেওয়া হয়। শিশুকন্যাটি যখন বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে, তখন সে এই প্রকল্পের আওতায় স্কলারশিপ পায়। এই স্কলারশিপের টাকাটিও শিশুকন্যার নামে অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দেওয়া হয়। ১৮ বছর পূর্ণ হলে সুদ সহ এই গচ্ছিত টাকাটি সেই বালিকা তার নিজের হাতে পেয়ে যাবে, যদি তার আগেই মেয়েটির বিয়ে না হয়ে যায়।

শ্রেণীভিত্তিক স্কলারশিপের তালিকা নীচে দেওয়া হল :

কোন শ্রেণীতে পড়ার সময়	বছরে কত টাকা স্কলারশিপ বা বৃত্তি
প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী	৩০০ টাকা
চতুর্থ শ্রেণী	৫০০ টাকা
পঞ্চম শ্রেণী	৬০০ টাকা
ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণী	৭০০ টাকা
অষ্টম শ্রেণী	৮০০ টাকা
নবম থেকে দশম শ্রেণী	১০০০ টাকা

বালিকা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় সহায়তা পাওয়ার জন্য স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আবেদন করতে হয়। আবেদন পত্রটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সুপারিশ সহ সিডিপিও-র অফিসে জমা দিতে হবে।

৪২) বয়:সন্ধিকাল বলতে কী বুঝি ?

উঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বয়:সন্ধিকাল বলে। ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের, অর্থাৎ বয়:সন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের কিশোর-কিশোরী বলা হয়। এই সময় ছেলেদের এবং মেয়েদের দেহে, মনে ও আচরণে অনেক পরিবর্তন ঘটে। কিশোর কিশোরীদের মনে এই সময় নানান ধরনের প্রশ্ন জাগে এবং তারা নানান সমস্যার মুখোমুখি হয়। কিন্তু প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও সমস্যা সমাধানের উপায় জানা না থাকায় তারা অসহায় বোধ করতে পারে। এই পরিবর্তনগুলি যে স্বাভাবিক তা বোঝানোর জন্য মা-বাবা, পরিবার ও সমাজের সকলের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন।

৪৩) কিশোরী শক্তি যোজনা কী ?

উঃ কিশোরী শক্তি যোজনা হল নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল বয়ঃসন্ধিকালীন (১১ - ১৮ বছর বয়স) কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক উন্নয়ন। এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হয় সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলঃ-

- বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো ।
- স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- কিশোরীদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলা।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বন ও ক্ষমতায়ণে সহায়তা করা।
- বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের উপরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপ্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা।

এই প্রকল্পের সহায়তা পাওয়ার জন্য অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী অথবা ব্লকে সি.ডি.পি.ও.-র সাথে যোগায়োগ করতে হবে।

৪৪) ঋতুস্রাব কী ?

উঃ প্রতি মাসে মেয়েদের যে রক্তস্রাব হয় সেটাই ঋতুস্রাব বা মাসিক। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সে সাধারণত কিশোরীদের মাসিক শুরু হয়। ১৬ বছরের পরেও কোনো কিশোরীর মাসিক শুরু না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। মাসিক চলাকালীন কিশোরীদের নিয়মিত স্নান করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। তবে পুকুরে নেমে স্নান করলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে যে কাপড় ব্যবহার করা হয়, সেটি সাবান দিয়ে কেচে রোদে ভাল ভাবে শুকনো করে তবেই ব্যবহার করা উচিত। এই কাপড় পুকুরে ধোওয়া উচিত নয়। তা না হলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

৪৫) বয়:সন্ধিকালের মেয়েদের কী কী যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ?

উঃ বয়:সন্ধিকালের মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। এই বয়সে যেহেতু প্রতি মাসে শরীর থেকে নিয়মিত রক্ত বেরিয়ে যায়, তাই সবুজ শাকসব্জি বেশি বেশি খাওয়া দরকার। প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকর্মী বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাছ থেকে আয়রন বড়ি নিয়ে খাওয়া দরকার।

৪৬) প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি ?

উঃ মানুষের প্রজনন তন্ত্র একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে মানুষের বংশবৃদ্ধি ঘটে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রজনন অঙ্গগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকা এবং

রোগ সংক্রমিত হলে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ থাকাটাই প্রজনন স্বাস্থ্য। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় নিরাপদ যৌন জীবন, নিরাপদ ও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পরিবারকল্যাণ পদ্ধতি গ্রহণ এবং নিরাপদে গর্ভধারণ, নিরাপদ প্রসব ও সুস্থ-সবল সন্তানের জন্মদান।

৪৭) ছেলেদের বিয়ের বয়স কত ?

উঃ দেশের আইন অনুসারে ছেলেদের বিয়ের বয়স অন্তত ২১ বছর হওয়া দরকার।

৪৮) মেয়েদের বিয়ের এবং মা হওয়ার বয়স কত ? কেন ?

উঃ মেয়েদের বিয়ের বয়স অন্তত ১৮ বছর হওয়া দরকার। দেশের আইন অনুসারে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যায় না। ১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েরা বিয়ের জন্য শারীরিক ও মানসিক ভাবে পরিণত হয় না। বিয়ের সঙ্গে গর্ভধারণের বিষয়টি জড়িত । ১৯ বছরের আগে, মা হওয়ার জন্য যে শারীরিক অবস্থা দরকার, তা থাকে না এবং প্রজনন অঙ্গগুলি পরিপুষ্ট হয় না। বিশেষ করে জরায়ুটি গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত হয় না। ১৯ বছরের আগে গর্ভধারণের ক্ষেত্রে প্রসবকালীন সমস্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, কম ওজনের শিশুর জন্ম হতে পারে । তাই ১৯ বছর বয়সের আগে মা হওয়া, মা ও শিশু, দুই জনের জন্যই বিপজ্জনক হতে পারে।

আঠারোর পরে বিয়ে হয়ে
একুশে হলে মা
মা ও শিশুর প্রাণের ঝুঁকি
মোটেই রবে না

৪৯) সক্ষম দম্পতি বলতে আমরা কী বুঝি ?

উঃ সক্ষম দম্পতি বলতে এমন স্বামী-স্ত্রীকে বোঝানো হয়ে থাকে, যাদের মধ্যে স্ত্রীর বয়স ১৫ বছর থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে।

এই বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে হওয়া অনুচিত ও বেআইনি, অতএব ১৫ বছর বয়সী স্ত্রীকে সক্ষম দম্পতির আওতায় রাখা হবে কেন ? উত্তরে বলা যায় যে, ১৫ বছরে বা তার আগে কোনো কিশোরীর বিয়ে হলে তা বেআইনি ও অনুচিত হলেও সমাজে এই রকম ঘটনা অজস্র ঘটে থাকে। ফলে, অল্প বয়সেও তার সন্তান-সম্ভবা হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। এই জন্য তাকে সক্ষম দম্পতির আওতায় রাখা হয়।

৫০) দুইটি সন্তানের জন্মের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন ? কেন ?

উঃ প্রথম সন্তানের জন্ম থেকে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের ব্যবধান কম করে তিন বছর হওয়া প্রয়োজন। কারণ, একটি সন্তান প্রসবের পরে পরবর্তী আরেকটি সুস্থ শিশু প্রসব করার জন্য মায়ের শরীর তৈরি হতে কম করে ৩ বছর সময় লাগে।

প্রথম সন্তান স্কুলে পাঠাবো
তবেই একটি ভাবতে পারবো

৫১) অধিক সন্তানের মা হওয়া কেন বিপদজনক ?

উঃ অধিক সন্তানের মা হলে মায়ের শরীর ভেঙ্গে যায়, বাকি জীবন মা নানারকম রোগে ভোগেন। বেশি সন্তান হলে অপুষ্ট শিশু জন্মানোর আশঙ্কা থাকে। এছাড়া সন্তানের যত্ন যথেষ্ট হয় না, আর সংসার খরচের উপর চাপ পড়ে।

দুটির বেশি কভি ভি নেহি
ছেলে না মেয়ে কুছ পরোয়া নেহি

৫২) পরিকল্পিত পরিবার বলতে কী বুঝি ?

উঃ পরিকল্পিত পরিবার বলতে বোঝায় (ক) দুইটির বেশি সন্তান না নেওয়া, (খ) দুইটি সন্তানের মধ্যে কম করে তিন বছরের ব্যবধান বা ফারাক রাখা, (গ) কম ব্যবধান বা ফারাকে যাতে সন্তান না আসে বা অধিক সন্তান যাতে না হয় তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। এই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর নিকট জন্ম নিরোধক উপকরণ (খাওয়ার বড়ি, কন্ডোম, কপার-টি ইত্যাদি) পাওয়া যায়।

৫৩) বন্ধ্যাকরণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদ্ধতি আছে ?

উঃ বন্ধ্যাকরণ একটি স্থায়ী পদ্ধতি। পুরুষদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি হল ভ্যাসেকটমি। ভ্যাসেকটমির জন্য যে কোনো সরকারি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রে/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে। অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, ভ্যাসেকটমির ফলে পুরুষদের কর্মক্ষমতা বা যৌনক্ষমতা চলে যায়। এইটি খুবই ভুল ধারণা। এইটি খুবই ছোট্ট অপারেশন। এতে কর্মক্ষমতাও কমে যায় না বা যৌনসুখও হ্রাস পায় না। মহিলাদের জন্য বন্ধ্যাকরণের স্থায়ী পদ্ধতি হল টিউবেকটমি।

মা-বাপ হওয়া মুখের কথা ?
প্রস্তুতি চাই ও যোগ্যতা
পণ করেছি এক জুটিতে
থাকবো খুশি দু-একটিতে
হোক না ছেলে কিম্বা মেয়ে
বাড়বে সমান আদর পেয়ে

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অস্থায়ী পদ্ধতিগুলির মধ্যে পুরুষদের জন্য হল

কন্ডোম। আর মহিলাদের জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রক বড়ি, আই.ইউ.ডি. (কপার-টি) ইত্যাদি। এই সব জিনিস বা পরিষেবা বিনা পয়সায় সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাছ থেকেও এ বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

৫৪) গর্ভপাত কি বৈধ নাকি বেআইনি ?

উঃ গর্ভপাত সম্পর্কে অনেকের মধ্যে সংশয় বা একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে ১৯৭১ সালে গর্ভপাত আইন চালু হয়েছে। এখন গর্ভপাত নারীর আইনগত অধিকার। তবে বৈধ গর্ভপাতের কয়েকটি শর্ত আছে। বৈধ গর্ভপাতের শর্তগুলি হল -

- গর্ভবতী মহিলা নিজের ইচ্ছায় কোনো রেজিস্টার্ড ডাক্তার দিয়ে বা সরকার স্বীকৃত হাসপাতাল বা ক্লিনিকে বৈধ গর্ভপাত করাতে পারেন।
- যদি কোনো কারণে গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মহিলার কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ডাক্তার গর্ভপাতের নির্দেশ দিতে পারেন।
- যদি ধর্ষণের ফলে গর্ভসঞ্চার হয় এবং মহিলা গর্ভপাত করাতে চান, তাহলে গর্ভপাত করানো যায়।
- অবিবাহিতা নারীও গর্ভপাত ঘটাতে পারে। তবে ১৮ বছরের কম বয়সী নারীর গর্ভপাতের ক্ষেত্রে অভিভাবককে সঙ্গে থাকতে হবে।

গর্ভপাত কখন বেআইনি

- হাতুড়ে ডাক্তার, ওঝা, দাই প্রভৃতিকে দিয়ে গর্ভপাত ঘটালে
- গর্ভবতী নারীর অজ্ঞাতে তার গর্ভপাত ঘটালে
- কন্যা-ভ্রূণ হত্যার উদ্দেশ্যে গর্ভপাত ঘটালে

অবৈধ গর্ভপাত যারা ঘটায় এবং এজন্য যারা যোগাযোগ করে বা সহায়তা করে তারা প্রত্যেকেই অপরাধী বলে গণ্য হয় এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে আইন অনুসারে তারা শাস্তি পেতে পারে।

৫৫) প্রজনন তন্ত্রে সংক্রমণ কী ? কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায় ?

উঃ মূলত এই সংক্রমণ ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা, অপরিষ্কার জল ও কাপড় ব্যবহারের ফলে প্রজনন তন্ত্রে হয়ে থাকে। মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই প্রজনন তন্ত্রে সংক্রমণ হতে পারে কিন্তু মহিলাদের মধ্যেই এই সংক্রমণের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। অনেকসময় এই সংক্রমণ মহিলাদের গর্ভধারণে সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রজনন তন্ত্রে ঘা, অতিরিক্ত ও গন্ধযুক্ত স্রাব এই সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কার জল ও কাপড় ব্যবহার করলে এই সংক্রমণ এড়ানো যায়।

প্রজনন তন্ত্রে সংক্রমণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিহ্নিত করে যদি চিকিৎসা করা হয় তাহলে এই রোগ নিরাময় সম্ভব ।

৫৬) যৌন রোগ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

উঃ যৌন রোগ আছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলন হলে যৌন রোগ হতে পারে। গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি হল কয়েকটি যৌন রোগের নাম। একটু সচেতন থাকলে এবং স্বাস্থ্যবিধান / ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চললে যৌন রোগগুলি এড়িয়ে চলা সম্ভব। বেশির ভাগ যৌন রোগই যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে যায়, তাই গোপন না করে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা ও চিকিৎসা করানো দরকার। তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এইচ.আই.ভি. /এইডস এর ক্ষেত্রে এখনো কোনো ওষুধ বা প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার হয়নি। এইচ.আই.ভি. /এইডস সম্পর্কিত শিক্ষাই হচ্ছে এর একমাত্র প্রতিষেধক। এইচ.আই.ভি./এইডস মানুষের শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ নষ্ট করে দেয়, ফলে নানা রোগের সৃষ্টি হয় এবং রোগী মারাও যেতে পারে। মনে রাখতে হবে প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ কিন্তু যৌন রোগ নয়।

৫৭) এইচ. আই. ভি./এইডস কী ? এই রোগ কীভাবে সংক্রামিত হয় ?

উঃ এইডস হল একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই ভাইরাসটির নাম হল - হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচ. আই. ভি.)। এইডসের পুরো কথাটি হল - অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম।

কীভাবে এইচ. আই. ভি. সংক্রামিত হয় :

- **যৌন সংসর্গে ঃ** সংক্রামিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে।
- **রক্তের মাধ্যমে ঃ** এইচ. আই. ভি সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত সুস্থ মানুষের শরীরে গেলে।
- **সুচ ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে ঃ** যে সুচ ও সিরিঞ্জ দিয়ে এইচ. আই. ভি.-তে আক্রান্ত লোককে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, সেই সংক্রামিত সুচ ও সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে তা দিয়ে অন্যকে ইঞ্জেকশন দিলে।
- **মায়ের থেকে গর্ভের শিশুর মধ্যে ঃ** এইচ. আই. ভি.- তে সংক্রামিত গর্ভবতী মহিলার থেকে গর্ভের শিশুর মধ্যে এইচ. আই. ভি. সংক্রামিত হতে পারে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার নিম্নলিখিত উপায়ে এইচ. আই. ভি. ছড়ায় না :

- হাঁচি, কাশি, খাবার ও মশার মাধ্যমে
- একই ঘরে থাকলে বা একই বাথরুম ব্যবহার করলে
- সামাজিক মেলামেশায় - হাতে হাত মেলালে, আলিঙ্গন করলে

৫৮) এইচ. আই. ভি. / এইডস প্রতিকারের উপায় কী ?

উঃ দুঃখের বিষয় এই যে, এখনো পর্যন্ত এইডসের কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তবে, সরকারি হাসপাতালে কিছুটা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি সরকারি জেলা হাসপাতালে ভি.সি.টি.সি. কেন্দ্র আছে, এখানে পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

যে সমস্ত কারণে এইচ. আই. ভি. সংক্রামিত হতে পারে, সেই সেই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা বা সতর্ক থাকাই হল এইডস প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। এছাড়া সরকারের তরফে এইচ. আই. ভি./এইডস বা যৌনরোগ সংক্রান্ত বিষয়ে টেলিফোনেও পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বি.এস.এন.এল. টেলিফোন থেকে ১০৯৭ নম্বর ডায়াল করে উক্ত পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। এই নম্বরে টেলিফোন করার জন্য কোনো খরচ হয় না। তাছাড়া, যে টেলিফোন করে, তার পরিচয় কঠোর ভাবে গোপন রাখা হয়।

জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৫৯) একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কী কী করা দরকার ?

উঃ একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সাধারণভাবে যেগুলি করা দরকার সেগুলি হল :

- ❖ স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলা (৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন)
- ❖ পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- ❖ বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার করা ইত্যাদি

৬০) নিরাপদ পানীয় জল বলতে কী বোঝায় ? কেন নলকূপের চাতাল/পাড় বাঁধানো আবশ্যক ?

উঃ মাটির উপরের জল নানাভাবে দূষিত হয়। মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করলে বা আবর্জনা ফেললে বৃষ্টির জলে ওই সব ধুয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়। পুকুরের জলে জামা কাপড় কাচা হয়, গরু মোষ স্নান করানো হয়। এই রকম নানা ভাবে জল দূষিত হয়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ রোগ ছড়ায় জলের মাধ্যমে।

সেই জন্য পানীয় জল অবশ্যই নিরাপদ হতে হবে। পানীয় জলে কোনো রকম জীবাণু বা ক্ষতিকর খনিজ পদার্থ না থাকলেই তাকে নিরাপদ পানীয় জল বলে। মাটির নীচের জল মোটামুটি নিরাপদ। মাটি ছাঁকনির কাজ করে। তবে কোনো কোনো জায়গায় মাটির নীচের জলেও আর্সেনিক বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকতে পারে। সেই জন্য নিয়মিত জল পরীক্ষা করা উচিত।

মাটির নীচের নিরাপদ পানীয় জল পাওয়ার জন্য নলকূপ বসানো হয়। সরাসরি নলকূপের জলে কেউ কেউ কুলকুচি করেন, নাক ঝাড়েন, নোংরা ফেলেন। এখন নলকূপের চাতাল বাঁধানো না থাকলে মাটির উপরের জল নলকূপের পাইপের গা বেয়ে মাটির নীচে চলে যায় ও নীচের জলকে দূষিত করে। যেসব এলাকায় কুয়োর জল ব্যবহার করা হয় সেখানে কুয়োর পাড় উঁচু করে বাঁধাতে হয়, কুয়োর ওপরে জাল বা ঢাকা দিয়ে রাখতে হয় এবং মাঝে মাঝে টাটকা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জল শোধন করতে হয়।

৬১) পানীয় জলকে নিরাপদ করার উপায় কী ?

- পানীয় জলকে অন্তত ২০ মিনিট ধরে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খাওয়া
- পানীয় জলকে পরিষ্কার পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখা
- পানীয় জলে হাত না ডোবানো
- পানীয় জলের উৎস ও তার চারপাশ পরিষ্কার রাখা
- নলকূপের চাতাল / কুয়োর পাড় বাঁধানো

৬২) প্রধান প্রধান জলবাহিত রোগ কী কী ?

উঃ ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েড, কলেরা, পোলিও - এগুলি হল কয়েকটি জলবাহিত রোগের নাম।

৬৩) জলবাহিত রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলি কী কী ?

- সর্বদা নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার করা
- নোংরা পুকুর, ডোবা ইত্যাদির জল দিয়ে বাসন না মাজা, রান্না না করা, হাত-পা না ধোওয়া বা জলশৌচ না করা
- পুকুর বা অন্যান্য জলের উৎসগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখা
- পুকুরের চারপাশে মলমূত্র ত্যাগ না করা
- পুকুরে কাপড় না কাচা
- পুকুরের মধ্যে বাড়ির নোংরা জল / শুকনো ফুল-পাতা / জঞ্জাল না ফেলা

৬৪) ডায়রিয়া কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

উঃ ডায়রিয়া এমন একটি অসুখ যা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। নানান জীবাণু, বিশেষত মলের জীবাণু পেটে গেলে ডায়রিয়া হয়। প্রধানত জলের মাধ্যমে রোগটি ছড়ায়। যদি প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকায় সকলে মিলে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে যে সব কারণে ডায়রিয়া হয়, তা রোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা যায়। এর জন্য গ্রাম সংসদ এলাকার প্রতিটি পরিবারকে শৌচাগার তৈরি করতে হবে এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে শৌচাগার ব্যবহার করতে হবে। শৌচাগার তৈরির ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

যেখানে সেখানে মলত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। জলের উৎসকে মানুষ বা জন্তুর মলের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নলকূপের চাতাল বাঁধানো

থাকতে হবে। মশা-মাছির প্রকোপ যাতে না বাড়তে পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। খাদ্য ও পানীয় জল ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। সবার মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসগুলি (যেমন শৌচের পর ও খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া ইত্যাদি) গড়ে তুলতে হবে। কোনো এলাকায় সকলে মিলে এরকম একটি প্রয়াস নিলে তবেই পুরো এলাকায় ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে অনেক জল বেরিয়ে যায়, তাই শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে। সেজন্য ডায়রিয়া হলে ও.আর.এস. খেতে হয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা ওষুধের দোকানে ও.আর.এস. পাওয়া যায়। ও.আর.এস.-এর প্যাকেটে যেরকম নির্দেশ দেওয়া থাকে ঠিক সেই ভাবে ও.আর.এস. দ্রবণ তৈরি করতে হবে। জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে এক চিমটে নুন, এক চামচ চিনি মিশিয়ে ঘরেই ও.আর.এস. তৈরি করে নেওয়া সম্ভব।

৬৫) পারিবারিক শৌচাগার তৈরি ও ব্যবহার করা প্রয়োজন কেন ?

উঃ মানুষের মলের মধ্যে দিয়ে অনেক ধরনের রোগ জীবাণুও বার হয়। কাজেই যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করলে সেই মল ও তার সঙ্গের জীবাণু আমাদের ব্যবহারের জলের মধ্যে মিশে যেতে পারে অথবা মাছির দ্বারা খাবারে মিশতে পারে। সেই দূষিত জল বা খাবার সুস্থ মানুষের শরীরে গেলে রোগ সংক্রমণ হয়। তাই, পরিবেশ দুষণমুক্ত রাখতে, জলবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস করতে, মহিলাদের আব্রু বা সম্মান রক্ষা করতে এবং স্বাস্থ্যবিধান ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার প্রসারের দ্বারা এলাকার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটানোর জন্য পারিবারিক শৌচাগার তৈরি করা ও তা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৬৬) খাওয়ার আগে এবং জলশৌচের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া প্রয়োজন কেন ?

উঃ আমাদের হাতে প্রচুর পরিমাণে রোগ জীবাণু, ধুলো-ময়লা লেগে থাকে - যা খালি চোখে দেখা যায় না। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত না ধুলে ওইগুলি আমাদের অজান্তেই খাবারের সাথে শরীরে প্রবেশ করে নানান রোগের কারণ ঘটায়। একই রকম ভাবে শৌচের পরে সাবান দিয়ে হাত না ধুলে মলের মধ্যে থাকা রোগ জীবাণু অথবা জলশৌচের পর মাটিতে হাত ঘষলে কৃমি বা কৃমির ডিম আমাদের হাতে, বিশেষত নখের মধ্যে বাসা বাঁধে। পরে তা খাবারের সঙ্গে আমাদের শরীরে ঢোকে। তাই খাওয়ার আগে এবং শৌচের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

৬৭) মশার কামড়ে কী কী রোগ হয় ?

উঃ মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গি, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি রোগ হয়।

৬৮) ম্যালেরিয়া কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

উঃ ম্যালেরিয়া একটি মারাত্মক অসুখ যা মশার কামড় থেকে ছড়ায়। মশারা যাতে প্রজননের মাধ্যমে বাড়তে না পারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে পরিবার এবং গ্রাম সংসদ এলাকার প্রত্যেক সদস্য ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে পারেন। জমে থাকা পরিষ্কার জলে মশাদের প্রজনন ভাল হয়। কাজেই বাড়ির কাছাকাছি জল জমে থাকে এমন জায়গা থেকে জল বের করে দিতে হবে, জলের পাত্র অথবা ট্যাঙ্কের মুখ ঢেকে দিতে হবে, বাড়ির চারদিক পরিষ্কার রাখতে হবে। সকলে মিলে এরকম প্রচেষ্টা নিলে তবেই এলাকায় ম্যালেরিয়া এবং মশার কামড় থেকে হয় এমন অসুখ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এর সঙ্গে সারা বছর মশারি ব্যবহার করা প্রয়োজন। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা শুরু করানো দরকার। জ্বর তাড়াতাড়ি সেরে গেলেও ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে পূর্ণ চিকিৎসা করানো উচিত।

৬৯) থ্যালাসেমিয়া কী ধরনের রোগ ?

উঃ থ্যালাসেমিয়া হল এক ধরনের রক্তের রোগ। এই রোগ হলে রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না, ফলে রোগী তীব্র রক্তাল্পতায় ভোগে। এইটি একটি বংশগত রোগ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃদু রক্তাল্পতা ছাড়া রোগীর শরীরে এই রোগের আর কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

৭০) থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণগুলি কী কী ?

উঃ শিশুর জন্মের সময় বা শৈশবের প্রথম দিকে এই রোগের লক্ষণগুলি বোঝা যায়। থ্যালাসেমিয়া রোগের

প্রধান লক্ষণগুলি হল :

- দুর্বল ভাব, ক্লান্ত লাগে ও মাথা ব্যথা হয়।
- চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায় বা জন্ডিসের মতো হলুদ হয়ে যায়।
- পেট ও লিভার ফুলে যায়।
- শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
- শরীরের স্বাভাবিক ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

৭১) থ্যালাসেমিয়া রোগ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

উঃ দুঃখের বিষয় এই যে, থ্যালাসেমিয়া রোগের কোনো প্রতিকার নেই। তবুও শিশুর জন্মের আগে বাবা-মার রক্ত পরীক্ষা করে এই রোগ চিহ্নিত করা সম্ভব। তাই কারুর যদি থ্যালাসেমিয়া থাকে, তাহলে তা নিজের শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই নীচের যত্নগুলি নিতে হবে :

- চিকিৎসা ঠিক মতো করাতে হবে এবং নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- যদি নিয়মিত রক্ত নেওয়ার দরকার হয়, তাহলে অবশ্যই তা নিতে হবে।
- ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে খাবার ও ওষুধ খাওয়াতে হবে।

থ্যালাসেমিয়া রোগ হলে সাধারণত নিয়মিত রক্ত নেওয়ার দরকার হয়। তাই যাতে প্রয়োজন মতো থ্যালাসেমিয়া রোগী হাসপাতালে বা ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত পায়, সেজন্য নিজের নিজের গ্রাম সংসদে 'রক্তদান শিবির' আয়োজন করা যেতে পারে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্ত পাওয়া সুনিশ্চিত করা দরকার।

৭২) চর্মরোগ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

উঃ আমাদের শরীরের চামড়া শরীরকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, শরীরের তাপ ঠিক রাখে ও রোগ জীবাণু ঢোকার হাত থেকে রক্ষা করে। ব্যক্তিগত এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতার অভাবে বেশ কয়েকটি চর্মরোগ হয়। যেমন - দাদ, চুলকানি, খোস, পাঁচড়া ইত্যাদি। সেই জন্য স্বাস্থ্যবিধান /ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা দরকার।

৭৩) কুষ্ঠ হলে কীভাবে বোঝা যায় ? এই রোগটি কীভাবে ছড়ায় ?

উঃ কুষ্ঠ রোগের প্রধান লক্ষণ হল দেহের কোনো কোনো অংশে সাড় বা অনুভূতি না থাকা, বিশেষ করে হাতে আর পায়ে। চামড়ার মধ্যে ফ্যাকাসে বা সাদা দাগ যেখানে সাড় থাকে না অথবা পুরোনো ঘা যাতে ব্যাথা

নেই বা চুলকায় না - এগুলি কুষ্ঠের অন্যতম লক্ষণ। এই রোগ হলে কানের লতি মোটা হয়ে যেতে পারে এবং ভুরুর চুল প্রায় পড়ে যায়। কুষ্ঠ ছোঁয়াচে নয়। সব সময় সবার মধ্যে এই রোগের লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে না।

৭৪) কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা আছে কি ?

উঃ হ্যাঁ, কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা আছে। নিয়মিত চিকিৎসা করালে এবং সময় মতো ওষুধ খেলে এই রোগ সেরে যায়। যদি ওষুধ ব্যবহার করার সময় অন্য প্রতিক্রিয়া, যেমন - হাতে পায়ে ব্যাথা, জ্বর ইত্যাদি হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও কুষ্ঠ রোগীদের কিছু সাধারণ সাবধানতা মেনে চলা দরকার। প্রত্যেক স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র, সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

৭৫) কুষ্ঠ রোগীদের কী কী সাবধানতা নেওয়া উচিত ?

উঃ যেহেতু কুষ্ঠ হওয়া জায়গায় ব্যথা লাগে না, তাই লোকে ঐ জায়গাগুলির যথেষ্ট যত্ন নেন না। ফলে, সেগুলিতে সংক্রমণ হয় আর ধীরে ধীরে তা হাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই জন্যই কারো কারো অঙ্গ বিকৃতি ঘটে। কিন্তু কয়েকটি সাধারণ সাবধানতাগুলি অবলম্বন করলে একজন কুষ্ঠ রোগী সহজেই স্বাভাবিক থাকতে পারেন আর অঙ্গ বিকৃতি এড়াতে পারেন।

কুষ্ঠ রোগীর জন্য কয়েকটি সাধারণ সাবধানতা

- কুষ্ঠ হওয়া জায়গায় যাতে ঘষা না লাগে, কেটে বা থেঁতলে না যায় বা ফোস্কা যাতে না পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে।
- সব সময় চটি বা জুতো ব্যবহার করতে হবে। যাতে ঘষা না লাগে তার জন্য পরিষ্কার নরম কাপড় লাগিয়ে বা জড়িয়ে নিতে হবে।
- রান্না করার সময় দস্তানা ব্যবহার করতে হবে, যাতে গরম না লাগে বা ফোস্কা না পড়ে।
- ধূমপান করা চলবে না।
- শরীরে কোনো কাটা, থেঁতলানো বা ফোস্কা বা ঘা হয়ে গিয়ে থাকলে পুরো স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেই জায়গাটি বিশ্রামে বা সাবধানে রাখতে হবে।

৭৬) যক্ষ্মা বা টি.বি. কী ? কীভাবে রোগটি ছড়ায় ?

উঃ যক্ষ্মা একটি সংক্রমিত রোগ। এই রোগ প্রধানত মানুষের ফুসফুসে হয়। অনেকসময় স্নায়ু, হাড় ও চামড়াতে এই রোগ হতে পারে। এই রোগ বাতাসের মাধ্যমে চড়ায়। সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি, থুতু, কফের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

৭৭) যক্ষ্মা রোগের লক্ষণগুলি কী, কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

উঃ যক্ষ্মা রোগের লক্ষণগুলি হল -

- বুকে ব্যথা
- কফের সাথে রক্ত
- তিন সপ্তাহ ধরে টানা কাশি
- জ্বর ও মাথা ব্যথা
- খিদে কমে যাওয়া ও বমি বমি ভাব
- ওজন কমে যাওয়া
- ক্লান্ত ভাব

প্রতিটি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র, হাসপাতালে এই রোগের চিকিৎসা হয়। লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে হাসপাতালে বিনামূল্যে রক্তপরীক্ষা করে ওষুধ (DOT) খেতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে যক্ষ্মা রোগের টিকা জন্মের সাথে সাথে বা ২০দিনের মধ্যে দেওয়া হলে শিশুটি এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।

৭৮) যক্ষ্মা রোগীদের কী কী সাবধানতা নেওয়া উচিত ?

উঃ যেহেতু যক্ষ্মার জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় তাই এই রোগ খুব দ্রুত একজন সংক্রামিত রোগীর থেকে সুস্থ মানুষের দেহে ছড়ায়। যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কয়েকটি সাধারণ সাবধানতা -

- হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত যোগাযোগ করা
- কফ পরীক্ষা করা
- ডটস্ (DOT) চিকিৎসা করা
- এই রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে
- কথা বলার সময়, কাশির এবং কফ তোলার সময় মুখে কাপড় চাপা দিতে হবে
- ঠান্ডা লাগানো চলবে না
- স্কুল, কলেজ বা বাইরের কাজ এই সময় বন্ধ রাখা উচিত

এটা মনে রাখতে হবে, যক্ষ্মা কখনোই হাতে হাত মেলালে, একই শৌচাগার ব্যবহার করলে, একই থালা বাটিতে খেলে এই রোগ ছড়ায় না।

৭৯) বিষাক্ত সাপের কামড় কীভাবে চেনা যায় ?

উঃ সাপের কামড়ের দাগ খুব একটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না। তবে বিষাক্ত সাপে কামড়ালে একজোড়া বিষদাঁতের দাগ, তার সঙ্গে কখনো কখনো সাধারণ দাঁতের দাগও থাকে। যে সাপের বিষ নেই সেই সাপ কামড়ালে বিষদাঁতের দাগ থাকে না, তবে দুই সারি সাধারণ দাঁতের দাগ পড়তে পারে (উপরের চোয়ালের)।

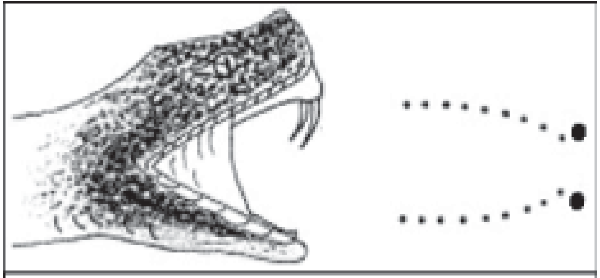

বিষাক্ত সাপের বিষদাঁত ও তার উপরের চোয়ালের দাঁতের দাগ

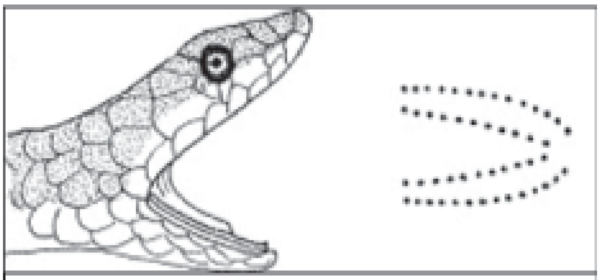

বিষহীন সাপের উপরের চোয়ালের দাঁতের দাগ

বিষাক্ত সাপে কামড়ালে সাধারণত কামড়ের জায়গায় যন্ত্রণা হয় বা জায়গাটি ফুলে যায়, তার চারদিকের চামড়ার রং বদলে যেতে পারে। অনেক সময় যাকে সাপে কামড়েছে তার ঘুম ঘুম ভাব আসে বা গা বমি বমি করে, বা কাশির সঙ্গে রক্তও পড়তে পারে। সাপে কামড়ানো রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

৮০) সাপে কামড়ানো রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা কী ?

উঃ মনে রাখা দরকার যে সাপের কামড়ে টোটকা বা ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি কাজ করে না। বিষাক্ত সাপের কামড় খুবই বিপজ্জনক। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার প্রয়োজন। তবে চিকিৎসা শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে নীচের কথাগুলি কাজে লাগতে পারে :

- রোগীকে শান্ত রাখুন। ভয় পেলে বা উত্তেজিত হলে রোগীর ক্ষতি হতে পারে।
- কামড়ানোর জায়গাটা নাড়াবেন না। এতে বিষ তাড়াতাড়ি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।
- কামড়ের একটু উপরে কাপড় দিয়ে এমন করে বাঁধুন, যাতে সেই বাঁধনের ভিতর দিয়ে একটা আঙ্গুল ঢোকানো যায় (অর্থাৎ বাঁধনটি যেন খুব শক্ত না হয়)।
- রোগীকে হাঁটা চলা করানো উচিত নয়।
- এবার একটি ব্লেডকে আগুনের শিখায় জীবাণুমুক্ত করে বিষদাঁতের দাগের মধ্যে ১ সেন্টিমিটার লম্বা আর আধ সেন্টিমিটার গভীর করে চিরে বিষ রক্ত বার করে দিন।

- মোটা কাপড়ে কয়েক টুকরো বরফ মুড়ে কামড়ের চারপাশে গুঁজে দিন।
- এবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যান।

৮১) রোগ প্রতিকারের তুলনায় রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা বেশি প্রয়োজন কেন ?

উঃ রোগ প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন চিকিৎসার, আর চিকিৎসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে টাকা খরচ, সময় দেওয়া। একই প্রসঙ্গে এসে যায় রোগীর ও তার পরিজনের কয়েক দিনের জন্য কর্মহীন/উপার্জনহীন হয়ে পড়া। কিন্তু আসলে আমরা যত রকম অসুখে ভুগি, তার অধিকাংশই অপরিচ্ছন্নতা ও খারাপ অভ্যাসের জন্য হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে সচেতন থাকলে স্বাস্থ্য ভালো রাখা সম্ভব এবং সহজে অসুখ এড়ানো যায়। রোগ প্রতিরোধের জন্য এলাকার অসুখগুলির প্রকোপ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা দরকার এবং কোন সময়ে কোন রোগ বাড়ে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তাই রোগে পড়ার আগে তার মোকাবিলা বা প্রতিরোধ করা বুদ্ধিমানের কাজ। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে আর অর্থ এবং সময়ের অপচয় বন্ধ হয়।

৮২) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কী আছে ?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রতি ৫০০০ জনসংখ্যা পিছু (পার্বত্য এলাকায় প্রতি ৩০০০ জনসংখ্যা পিছু) একটি করে স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র (সাব সেন্টার) থাকে এবং প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি সদর স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র থাকে। এছাড়াও ব্লক স্তরে প্রতি ৩০০০০ জনসংখ্যা পিছু একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পি এইচ সি) বা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (বি পি এইচ সি) থাকে। এই স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র, সদর স্বাস্থ্য উপ কেন্দ্র,

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের মাধ্যমে টিকাকরণ, সাধারণ অসুখের ওষুধ, পরিবার পরিকল্পনার সরঞ্জাম, আয়রন বড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

৮৩) কোথায় কত দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করা দরকার ? কেন ?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে ২১ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করতে হয়। জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করা কেবল মাত্র পরিসংখ্যানের বিষয় নয়। এই তথ্য এলাকার বর্তমান অবস্থা বুঝতে ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। এর থেকে নীচের বিষয়গুলি স্বচ্ছ ভাবে উঠে আসে।

- এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - যা থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা যায়।
- বিভিন্ন বয়সে মৃত্যুর তথ্য - যা বিশ্লেষণ করে এলাকার কোনো বিশেষ রোগ চিহ্নিত করা ও তার প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।
- শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃত্ব-জনিত মৃত্যুর হার ও তার কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
- শিশুর জন্মের সময় মায়ের বয়স এবং এর আগে ওই মায়ের কয়টি সন্তান হয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

৮৪) কীভাবে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বজায় রাখা যায় ?

উঃ শরীরে পুষ্টি বজায় রাখার জন্য সতেজ ও টাটকা শাকসব্জি খাওয়া উচিত। কাটার আগে শাকসব্জি ধুয়ে নেওয়া উচিত। পরে ধুলে অনেক ভিটামিন ও খনিজ লবণ নষ্ট হয়ে যায়। কোনো সব্জির খোসা ছাড়াতে হলে খুব পাতলা করে ছাড়ানো উচিত। কারণ ভিটামিন, খনিজ লবণের বেশির ভাগ খোসার ঠিক নিচে থাকে। আলু, বীট ইত্যাদি সব্জি খোসা সুদ্ধ সেদ্ধ করে পরে খোসা ছাড়ালেই ভালো। সব্জি যতটা সম্ভব বড় বড় করে কাটা উচিত। ছোট ছোট করে কেটে রান্না করলে পুষ্টি মান কমে যায়। শাকসব্জি সব সময় ঢাকা দিয়ে রান্না করা উচিত। শস্য জাতীয়, ডাল জাতীয় খাবার এক সঙ্গে রান্না করে খেলে তাতে পুষ্টিগুণ বেড়ে যায়। আটার সঙ্গে আলু সেদ্ধ কিম্বা শাক সেদ্ধ কিম্বা ডালের গুড়ো মিশিয়ে রুটি তৈরি করলে তার খাদ্যগুণ বেড়ে যায়।

৮৫) জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য মানে কী ?

উঃ 'জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য' কথাটির অর্থ হল - এলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও তার উন্নয়নের জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের এক সঙ্গে এক জোট প্রচেষ্টা নেওয়া। এই জন্য সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরো বেশি ব্যবহারের পাশাপাশি জনগণকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে। এলাকায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং স্বনির্ভর দলগুলিকে এই কাজে যুক্ত করতে হবে। তাদের কাজ হবে পাড়ার প্রত্যেকটি পরিবারের, বিশেষ করে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে নজর রাখা। এছাড়া প্রতি

গ্রাম সংসদে স্বাস্থ্য তহবিল গড়ে তোলা যেতে পারে - যার থেকে সহায়-সম্বলহীন পরিবারকে চিকিৎসার জন্য টাকা ধার বা সাহায্য দেওয়া যায়।

৮৬) জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা কী?

উঃ জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে - জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এলাকার মানুষ নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জানবেন, বুঝবেন ও দায়িত্ব পালনে সম্মিলিত ভাবে সচেষ্ট হবেন। এছাড়া সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের এলাকার সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা যে ভূমিকা পালন করছেন তাঁরা সেটা পালন

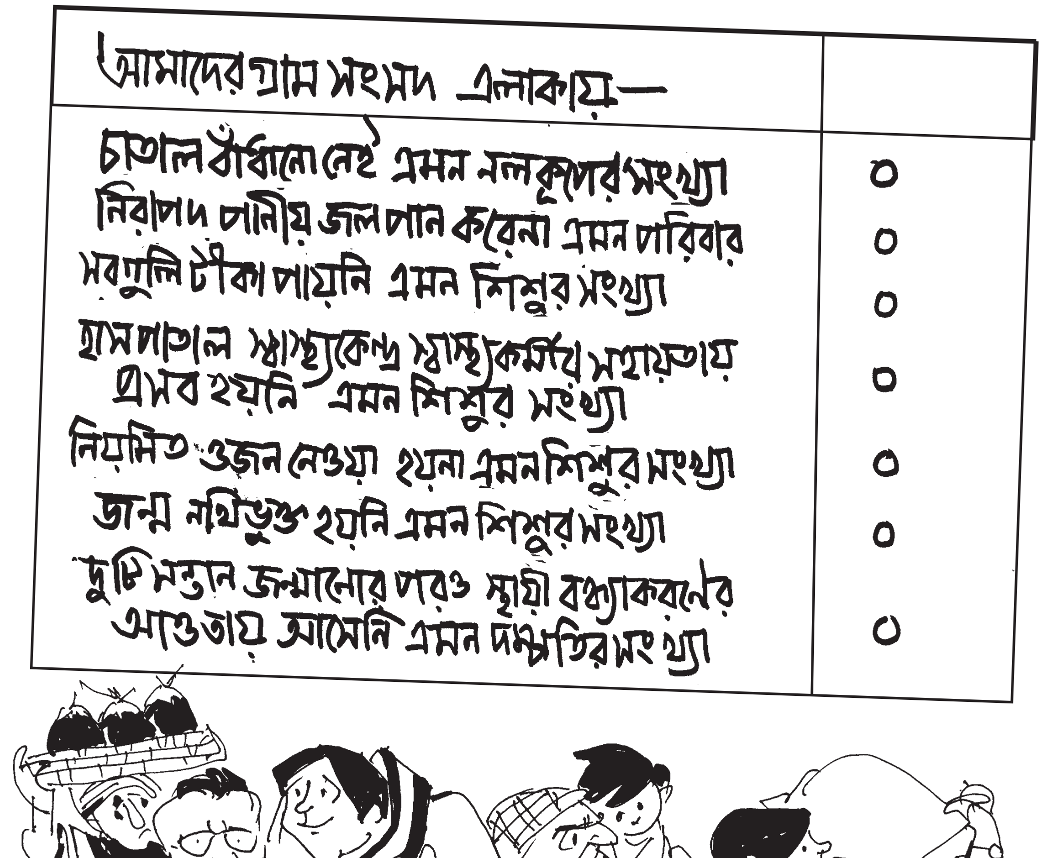

করবেন অর্থাৎ কোন অসুখের জন্য কী ওষুধ সেটা তারাই দেবেন। কিন্তু ওষুধ যাতে খেতে না হয় অর্থাৎ শরীর খারাপ যাতে না হয়, তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজটি করতে হবে জনগণকে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে। এর জন্য প্রতি গ্রাম সংসদ এলাকায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা শিবির বা প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে হবে।

৮৭) স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস কীভাবে ক্ষতি করে ?

উঃ দেখা যায়, ওষুধের সঙ্গে মনের জোর বা বিশ্বাস থাকলে মানুষের রোগ তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। কারণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে বোঝার ক্ষমতা আর ভয় না পাওয়ার সম্পর্ক আছে। কিন্তু কোনো কিছুর উপর কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস থাকলে উল্টো ফলও হতে পারে। যদি কেউ বিশ্বাস করে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে বা ক্ষতি করছে তাহলে সে সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। আবার যদি কেউ ভাবে কোনো ওঝা বা তাবিজ বা কবচ তাকে সুস্থ করে দিতে পারে, তাহলে ভুল চিকিৎসায় বা সঠিক সময়ে চিকিৎসার অভাবে সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে,

এমনকি মারাও যেতে পারে। তাই যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করা দরকার।

গ্রামের মানুষের মনে এখনও যে সকল কুসংস্কার আছে তার মধ্যে কয়েকটি হল - ওঝা বা গুনিন দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করানো, ডাইনি প্রথা, কবচ বা মাদুলি পরে রোগ আটকানো, তুকতাক করা বা নজর লাগা বা গুন করা বা বান মারার ভয়। কিন্তু অসুখ করা বা সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে এই সব কুসংস্কারের কোনো সম্পর্কই নেই। অসুখ করলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

সংযোজনী

সংযোজনী - **১ :** গ্রাম উন্নয়ন সমিতির জনস্বাস্থ্য কার্যকরী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সদস্যদের জন্য অনুশীলনের পাতা

সংযোজনী - ২ : **গ্রাম সংসদ স্তরে** জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য কী কী কাজ করা যেতে পারে তার তালিকা সহ আনুমানিক বাজেটের ছক

সংযোজনী - ৩ : **গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে** জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য কী কী কাজ করা যেতে পারে তার তালিকা সহ আনুমানিক বাজেটের ছক

সংযোজনী - ১

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির জনস্বাস্থ্য কার্যকরী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সদস্যদের জন্য অনুশীলনের পাতা

এই হাতবই থেকে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা ধারণা তৈরি হল। এবার সকলে মিলে দেখে নিই, আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় জনস্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন। একই সঙ্গে সকলে মিলে বুঝে নেবার চেষ্টা করি, এলাকায় জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য কোন কোন বিষয়ে আমরা কী কী করতে পারি ।

প্রঃ ১) স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে আমাদের গ্রাম সংসদে সকলের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা আছে তো ?

উঃ ———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

প্রঃ ২) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায়, বিশেষত মহিলাদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

প্রঃ ৩) আমাদের গ্রাম সংসদে, বর্তমানে সকল গর্ভবতী মহিলা সময় মতো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নাম লিখিয়েছেন তো ? যদি না লিখিয়ে থাকেন তাহলে এই বিষয়ে আমাদের কী ভূমিকা হতে পারে ?

উঃ ———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

প্রঃ ৪) আমাদের গ্রাম সংসদে, সকল গর্ভবতী মহিলা কি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ম মাফিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন ? তাঁদের সকলেই কি সব পরিষেবা পাচ্ছেন ?

উঃ ———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

প্রঃ ৫) আমাদের গ্রাম সংসদে, সকল গর্ভবতী মহিলার প্রসবের আগে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন ? যে সব পরিবারের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

প্রঃ ৬) আমাদের গ্রাম সংসদে, ৬ মাস বয়স পর্যন্ত সকল শিশু শুধু মাত্র মায়ের বুকের দুধই খায় তো ? এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

প্রঃ ৭) আমাদের গ্রাম সংসদে, সকল শিশু সার্বিক টিকাকরণের আওতায় এসেছে তো ? সার্বিক টিকাকরণ সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————

———————————————————————————

প্রঃ ৮) আমাদের গ্রাম সংসদে, সকল শিশুর নিয়মিত ওজন নেওয়া হয় কি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ৯) আমাদের গ্রাম সংসদে, গত এক বছরে কত জন কম 'জন্ম-ওজন'- এর শিশু জন্মেছে ? এই সব ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ১০) আমাদের গ্রাম সংসদে, বর্তমানে মোট কত জন কম ওজনের শিশু রয়েছে ? তাদের পুষ্টির জন্য আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ১১) আমাদের গ্রাম সংসদে, গত এক বছরে কোনো শিশু মৃত্যু হয়েছে কি ? হয়ে থাকলে কত জন ? শিশু মৃত্যু রোধ করার জন্য আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ১২) আমাদের গ্রাম সংসদে, গত এক বছরে কোনো মাতৃত্ব-জনিত মৃত্যু হয়েছে কি ? হয়ে থাকলে কত জন ? মাতৃত্ব-জনিত মৃত্যু রোধ করার জন্য আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ _

_ _

_ _

প্রঃ ১৩) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় অথবা কাছাকাছি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে কি ? যদি থাকে, তাহলে সেখানে কি সব শিশু নিয়মিত যায় ? কত জন শিশু নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায় না ? এই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ _

_ _

_ _

প্রঃ ১৪) আমাদের গ্রাম সংসদে, গত এক বছরে কতজন মেয়ের ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হয়েছে ? কতজন ছেলের ২১ বছরের নীচে বিয়ে হয়েছে ? কম বয়সে বিয়ে বন্ধ করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ _

_ _

_ _

প্রঃ ১৫) আমাদের গ্রাম সংসদে, বর্তমানে কত জন সক্ষম দম্পতি আছেন ? তাঁদের মধ্যে কত জন সক্ষম দম্পতি দুইটির বেশি সন্তানের বাবা-মা ? দুইটির বেশি সন্তান রয়েছে এমন সক্ষম দম্পতিকে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের আওতায় আনার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————————

———————————————————————————————

প্রঃ ১৬) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের কতগুলি উৎস আছে ? সেগুলি কোথায় এবং কী ধরনের ? কতগুলি নলকূপ বা কুয়োর পাড় এখনো বাঁধানো নেই ? প্রতিটি নলকূপ বা কুয়োর পাড় বাঁধানোর জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————————

———————————————————————————————

———————————————————————————————

প্রঃ ১৭) আমাদের গ্রাম সংসদে, কোন কোন কুয়ো বা নলকূপের চাতাল নিয়মিত পরিষ্কার থাকে না ? পানীয় জলের উৎসকে নিরাপদ রাখার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————————

———————————————————————————————

———————————————————————————————

প্রঃ ১৮) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় সব কয়টি পরিবার নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার করে তো ? পানীয় জলকে নিরাপদ করার উপায় সকলে জানেন তো ? এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ———————————————————————————————

———————————————————————————————

প্রঃ ১৯) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় খাওয়ার আগে এবং জলশৌচের পরে নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া সম্বন্ধে সকলের মধ্যে সচেতনতা আছে তো ?

উঃ ——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

প্রঃ ২০) আমাদের গ্রাম সংসদে, কয়টি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই ? যে সব পরিবারে শৌচাগার আছে তারা নিয়মিত তা ব্যবহার করে তো ? প্রতিটি পরিবার যাতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরি ও ব্যবহার করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

প্রঃ ২১) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় সাধারণত কোন সময়ে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশি দেখা যায় ? এলাকায় ডায়রিয়া রোধ করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

প্রঃ ২২) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় মশার উপদ্রব আছে কি ? এলাকায় কীভাবে মশার উপদ্রব কমানো যায় ? মশারি ব্যবহার সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

প্রঃ ২৩) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় কুষ্ঠ রোগী আছে কি ? তার চিকিৎসার জন্য আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ২৪) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় থ্যালাসেমিয়া রোগী আছে কি ? তার চিকিৎসার জন্য আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ২৫) গত এক বছরে আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় সাপের কামড়ে কোনো মৃত্যু হয়েছে কি ? এলাকায় সাপের কামড়ে মৃত্যু প্রতিরোধ করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ২৬) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় এমন কেউ আছেন কি - যারা খুবই অসুস্থ কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না ? তারা কারা ? তাদের আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ২৭) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় সঠিক সময়ে প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করা হয় তো ? এ সম্বন্ধে সকলের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ২৮) আমাদের গ্রাম সংসদে, কত জনের জননী সুরক্ষা যোজনা সুবিধা পাওয়ার কথা ? এর মধ্যে কত জন পেয়েছেন ? এ বিষয়ে আমরা কী সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ২৯) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় কত জন কন্যাশিশু বালিকা সমৃদ্ধি যোজনার সুবিধা পেতে পারে ? এক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কী হবে ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ৩০) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কুসংস্কার ও কু-অভ্যাস দূর করার জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ৩১) **আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় কত জন স্বাস্থ্যকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আছেন ? তাদের কাছ থেকে আমরা কীভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা সম্বন্ধে জানতে পারি এবং তাদের কাজে আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?**

উঃ —

— —

— —